নিরাপদ?

মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানে বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। রাত আটটার পর হইতে সমস্ত লোকাল ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের জন্য একটি মোবাইল নম্বর দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনে সেই নম্বর ব্যবহার করিয়া বিপন্ন যাত্রী রেলের সুরক্ষা বলয়ের সাহায্য চাহিতে পারিবেন। ছবি, ভিডিয়ো পাঠাইতে পারিবেন, এমনকি সরাসরি ফোন করিলেও সাহায্য মিলিবে। ইহা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। রাতের ট্রেন মহিলাদের জন্য নিরাপদ নহে, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা তাহার প্রমাণ। সুতরাং, রেলের পক্ষ হইতে যে সুরক্ষাব্যবস্থায় ফাঁক থাকিবার কথা স্বীকার করা হইয়াছে, এবং সেই ফাঁক মেরামতের উদ্যোগ করা হইয়াছে, তাহা আশাব্যঞ্জক। এই উদ্যোগ যাহাতে রেলের অন্য বিভাগগুলিতেও বিস্তৃত করা যায়, সেই বন্দোবস্ত আশু প্রয়োজন।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় এত বিলম্ব কেন? প্রসঙ্গত, দিল্লি গণধর্ষণের পর ২০১৩ সালে দেশব্যাপী মেয়েদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার নির্ভয়া তহবিল-এর সূচনা করে। প্রাথমিক ভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছিল প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। ২০১৫ সালে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল তহবিলের অধীন বিবিধ প্রকল্প, যেমন মহিলাদের অভিযোগ শুনিবার জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার গঠন, মেয়েদের জন্য হেল্পলাইন নম্বরগুলির সার্বিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় দেখাশুনার। সুতরাং, এখন দক্ষিণ-পূর্ব রেল যে উদ্যোগ করিয়াছে, তাহা বহু পূর্বেই করা যাইত। গণপরিবহণে মেয়েদের সুরক্ষার অভাবের প্রসঙ্গটি নূতন নহে। নির্ভয়া নিজেও গণধর্ষণের শিকার

হইয়াছিলেন গণপরিবহণেই। তৎসত্ত্বেও গণপরিবহণ তো বটেই, নারীসুরক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রত্যাশিত গতি আসে নাই। কারণ, বিভিন্ন রাজ্য বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগই খরচ করে নাই। কারণ হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে লাল ফিতার ফাঁস, অনিয়মিত বরাদ্দ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের কথা। সর্বোপরি, এই তহবিলের অর্থ এমন অনেক খাতে ব্যয় করা হইয়াছে, যাহার সঙ্গে নারীসুরক্ষা ও কল্যাণের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ, নারীকল্যাণ ও নিরাপত্তার বিষয়টিকে অনেকাংশেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কেন্দ্রেও নহে, রাজ্যেও নহে।

সুতরাং, নারীসুরক্ষায় সত্যই উদ্যোগী হইতে হইলে সর্বাগ্রে সর্বস্তরে ইহার গুরুত্বকে অনুধাবন করিতে হইবে। বিচ্ছিন্ন ভাবে যে উদ্যোগ হইতেছে, তাহা চলুক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকেও সামগ্রিক ভাবে একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থ আছে, অথচ সদ্ব্যবহার নাই ইহা অত্যন্ত লজ্জার। একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করিলেই, বা মহিলা থানা গড়িয়া তুলিলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না। হেল্পলাইনে ফোন করিয়াও সাড়া মিলে নাই, মহিলা থানা কার্যকর পদক্ষেপ করে নাই এমন অভিযোগ বিস্তর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীকে হেনস্থা হইতে হয় মেট্রোয়, বাসে, অ্যাপ ক্যাব-চালকের হাতে। মেয়েদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানা ক্ষেত্রে আপত্তিজনক ওট্রোলিং-এর শিকার হইতে হয় তাঁহাদের। অনেক ক্ষেত্রেই থানায় অভিযোগ জানাইয়াও প্রতিকার মেলে না। সর্বস্তরে মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হইলে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগগুলি চমকই থাকিয়া যাইবে, বাস্তব প্রতিফলন ঘটিবে না।

শিশু ও রাষ্ট্র

ভারতের শিশুদের কোভিড অতিমারি কতখানি বিপন্ন করিয়াছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ কত দূর অনিশ্চিত হইয়াছে, তাহা এখনও যথাযথ নির্ণয় হয় নাই। সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র জানাইয়াছে, ভারতে অনাথ শিশুর সংখ্যা অন্তত ১৯ লক্ষ, যাহা ভারতের সরকারি পরিসংখ্যানের বারোগুণ। গবেষকরা একটি গাণিতিক মডেল ব্যবহার করিয়া বিশ্বের সকল দেশে কোভিড-মৃত্যুহার হইতে অনাথ শিশুদের সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিশ্বের সকল দেশ মিলাইয়া অন্তত বাহান্ন লক্ষ শিশু অনাথ হইয়াছে, তাহাদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ভারতে। অথচ, সরকারি তথ্য অনুসারে, পিতা-মাতার কোনও এক জন, অথবা উভয়কেই হারাইয়া অভিভাবকহীন হইয়াছে, এমন শিশুর সংখ্যা দেড় লক্ষেরও কম। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এই বৎসর ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টে জানাইয়াছে, কোভিডের প্রথম কুড়ি মাসে ১ লক্ষ ৪২ হাজার শিশু অনাথ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক সংসদে জানাইয়াছে, অনাথ শিশুর ভাতা পাইবার জন্য বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৬৬২৪টি নাম জমা পড়িয়াছিল, ৩৮৫৫টি অনুমোদন পাইয়াছে। এই শিশুদের পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবার অথবা প্রতিষ্ঠান পিএম কেয়ার্স তহবিল হইতে মাসে দুই হাজার টাকা অনুদান পাইবে, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহারা দশ লক্ষ টাকা পাইবে। কিন্তু গোল বাধিয়াছে শিশুদের সংখ্যায়। কোথায় উনিশ লক্ষ, কোথায় তিন

হাজার! এই গতিতে শিশুদের নাম অনুমোদন করিবার পালা চলিলে অধিকাংশ শিশুরই শৈশব সহায়তাহীন কাটিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

সংখ্যার এই বিপুল বৈষম্যের মূলে রহিয়াছে মৃত্যুহার লইয়া সংশয়। ভারত সরকার কোভিডে মৃত্যুর যে হার স্বীকার করিয়াছে, অনেক বিজ্ঞানী অন্যান্য সূত্র হইতে, অথবা নিজেদের সমীক্ষা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাহার আট-দশগুণ অধিক মৃত্যুহারের দাবি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সংখ্যাতত্ত্বের বিতর্ক। অনাথ শিশুদের যথাযথ চিহ্নিতকরণ, সহায়তা দান ও তত্ত্বাবধানের বিষয়ে বাদানুবাদের অবকাশ নাই। কিন্তু সে কাজ করিবে কে? সারা বিশ্বই এই সমস্যার সম্মুখীন। দশ বৎসরে এইচআইভি-এডস বিশ্বের যত শিশুকে অনাথ করিয়াছিল, মাত্র দুই বৎসরে তাহা করিয়াছে কোভিড অতিমারি। কর্মক্ষম পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, অতএব শিশুর প্রতিপালনের দায় রাষ্ট্রের উপরেই বর্তাইয়াছে। কোন দেশের সরকার কতটা প্রস্তুত, সে প্রশ্নটি আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতের সমস্যা প্রধানত দুইটি। রাজনৈতিক দলগুলির সত্যগোপনের প্রবণতা, এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা। সরকারপক্ষ বিরোধীর সমালোচনা এড়াইতে কোভিডের মৃত্যুহার কম দেখাইবে, ফলে অনাথের সংখ্যাও দেখাইবে যৎসামান্য, তাহার সম্ভাবনা যথেষ্ট। অপর দিকে, লক্ষাধিক অনাথ শিশু চিহ্নিত হইলেও এক বৎসরে মাত্র হাজার তিনেক সরকারি ভাবে তহবিল হইতে সহায়তার অনুমোদন পাইয়াছে। এই গয়ংগচ্ছ মনোভাব এই ক্ষেত্রে অপরাধ। বহু অনাথ শিশু সরকারি পরিসংখ্যানের বাহিরে রহিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে। অতএব অতি সত্বর পঞ্চায়েত-পুরসভা স্তরে বিশেষ সমীক্ষা চালাইয়া অভিভাবকহীন

শিশুদের চিহ্নিত করিতে হইবে। তাহাদের যথাযথ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে রাজ্য ও কেন্দ্রকে।

পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টি

মানিতেই হইবে স্বামীর কথা এমত ধারণা প্রায় সকল ভারতীয়েরই। পাশাপাশি তাঁহাদের সমর্থন পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের নির্ধারিত ভূমিকার প্রতি। অর্থাৎ, পুরুষ বাহিরের কাজ করিবেন, স্ত্রী সামলাইবেন ঘর। আধুনিক ভারতের এই বাস্তব চিত্রটি ধরা পড়িয়াছে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায়। সেইখানে পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তো বটেই, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও মেয়েদের ভূমিকাকে এই দেশে কী ভাবে দেখা হইয়া থাকে, তাহার এক ধারণা মিলিয়াছে। প্রায় ৮০ শতাংশ ভারতীয় মনে করেন, যেখানে চাকুরির সংখ্যা সীমিত, সেখানে অবশ্যই পুরুষদের প্রাধান্য পাওয়া উচিত। অর্থাৎ, সমানাধিকার তত্ত্ব এবং নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত যে কথাগুলি এত দিন আলোচিত হইয়াছে, সরকারি এবং অ-সরকারি ক্ষেত্রে যেটুকু উদ্যোগ করা হইয়াছে, তাহা যে লিঙ্গবৈষম্যের শিকড়টিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা স্পষ্ট। নারী দিবসে ইহা অপেক্ষা অস্বস্তিকর বাস্তব আর কী হইতে পারে?

তবে এ-হেন পরিসংখ্যানে আশ্চর্য বোধ হয় না। সমাজে মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটি কী রূপ, তাহার প্রমাণ প্রাত্যহিক নানা ঘটনা হইতেই উঠিয়া আসে। সম্প্রতি যেমন কেরল হাই কোর্ট পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষকে তীব্র ভর্ৎসনা এবং সংশ্লিষ্ট

আধিকারিককে জরিমানা করিয়াছে এক বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলাকে তাঁহার নাবালিকা কন্যার পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে হয়রানির অভিযোগেও সিঙ্গল পেরেন্ট হিসাবে শিশুটির যাবতীয় দায়িত্ব তাঁহার এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও পিতার সম্মতি নাই, এই অজুহাতে নূতন করিয়া পাসপোর্টের আবেদন প্রক্রিয়াটিতে নানা রূপ বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সমীক্ষার সঙ্গে এই ঘটনাটির সরাসরি হয়তো কোনও যোগ নাই। কিন্তু উভয় ঘটনা প্রমাণ করে, সমাজে মেয়েদের স্বাধীন অস্তিত্ব এখনও অনেকাংশে স্বীকৃত নহে। সেই কারণেই মেয়েদের স্বাভাবিক অধিকারগুলিও তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিবার ক্ষেত্রে এক নিদারুণ অনীহা কাজ করে। সমাজ সমানাধিকারের কথা মুখে বলিতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নারীকে সে সর্বদা পুরুষের ছায়ার তলেই দেখিতে অভ্যস্ত।

এবং এই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহক অনেক মহিলাও। হয়তো শতাংশের হারে কিছু কম, কিন্তু প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক মহিলা বিশ্বাস করেন, স্বামীর কথা অবশ্যপালনীয়। গত বৎসর জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ অনেক রাজ্যেই অধিকাংশ মহিলা মনে করেন, স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিলে তাহা গর্হিত কাজ নহে। স্বামীকে না বলিয়া গৃহের বাহিরে পা রাখিলে, সংসারকে অবহেলা করিলে, স্বামীর সঙ্গে তর্ক করিলে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলাই যায়। গার্হস্থ হিংসার প্রতি মেয়েদের এই সমর্থন আশঙ্কার বইকি। আশঙ্কার মূল কারণ পুরুষতান্ত্রিকতার এই সর্বব্যাপ্তি, যাহা দীর্ঘ দিনই শুধুমাত্র পুরুষদের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের জায়গাটি আদৌ পুরুষ বনাম নারী নহে। ইহা একান্ত ভাবেই পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টি, যাহা মেয়েদের মধ্যেও সমান ভাবে বর্তমান, তাহার সঙ্গে নারী অধিকারগুলির দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস সূচনার পর প্রায় অর্ধশতক পার হইলেও সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা দূর অস্ত্।

লাল সঙ্কেত

সতর্কবার্তা ছিলই। জলবায়ু পরিবর্তন লইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট হইতে স্পষ্ট, এখন বিপদঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। বিপদ বিশ্বের, এবং সেই বিপন্ন বিশ্বে সর্বাধিক বিপন্ন দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। বিশেষত, এই দেশের শহরাঞ্চল এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে আগাইয়া চলিতেছে। ইহা হইবারই ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানবজীবন বিপর্যস্ত হইবে, বহু পূর্বেই বিজ্ঞানীরা তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই অনুমান এবং আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করিতেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটিয়া চলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রসঙ্গত, গত অগস্টে প্রকাশিত আইপিসিসি-র রিপোর্টে জলবায়ু পরিবর্তনকে কোড রেড আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। মানবজাতির লাল সঙ্কেত। সাম্প্রতিক রিপোর্ট প্রমাণ করিল, এই পরিবর্তনের মর্মান্তিক প্রভাব হইতে পরিত্রাণের পথটি ক্রমশ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর দেখাইতেছে।

ভারতের ক্ষেত্রে বিপদের মাত্রাটি সর্বাধিক মুম্বই, চেন্নাই, কলিকাতার ন্যায় শহরগুলির ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যেই পরিকল্পনাহীন নগরায়ণ এবং অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাসুল দিতেছে শহরগুলি। আশঙ্কা, ইহার সঙ্গে ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যুক্ত হইলে সেই বিপুল ক্ষতি সামলাইবার পরিকাঠামো অধিকাংশ শহরেরই থাকিবে না। সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলি জানাইতেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভারতের উপকূল অঞ্চলে একের পর এক মারণ ঝড় আছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বৃদ্ধি পাইবে সমুদ্রের জলস্তরও। এবং ভারতের অন্যান্য উপকূলের ন্যায় বাংলার উপকূলও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ক্ষতি শুধুই উপকূল অঞ্চলের

নহে। আমপান দেখাইয়া দিয়াছে, শহর কলিকাতাও আদৌ সুরক্ষিত নহে।

সামুদ্রিক ঝড় তো বটেই, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাইলে কলিকাতার বহু জায়গা জলের তলায় চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা। এবং জলবায়ু পরিবর্তিত হইলে তাহার প্রভাব শুধুমাত্র পরিবেশের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। জনস্বাস্থ্যের উপরেও পড়িবে। পতঙ্গবাহিত রোগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাইবে। গত বৎসর কলিকাতায় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছয় গুণ বৃদ্ধি

পাইয়াছিল। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইপিসিসি-র রিপোর্ট অনুযায়ী,

কলিকাতার পাশাপাশি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেও ছড়াইবে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া।

অথচ, এমন বিপদের মুখেও প্রশাসনিক স্তরে বিশেষ হেলদোল নাই। এই নিদারুণ

নিষ্ক্রিয়তাই যে জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য। কলিকাতাই যেমন। বায়ুদূষণে কলিকাতা দিল্লির তুলনায় খুব পিছাইয়া

নাই। অথচ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞ কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ের দুই বৎসর পার করিয়াও জমা পড়ে না। সমস্যা অন্যত্রও। গত বৎসরের রিপোর্ট

অনুযায়ী, এই শহরের অরণ্য আচ্ছাদনের পরিমাণ মাত্র ১.৮ বর্গ কিলোমিটার।

শহরের মোট আয়তনের এক শতাংশেরও কম। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, অরণ্য এবং

জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, এই পরিমাণ দেশের বৃহৎ শহরগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রুখিতে সবুজের

ভূমিকা নূতন করিয়া বলিবার নহে। অথচ, উন্নয়নের নামে বেহিসাবি বৃক্ষচ্ছেদন

চলিতেছেই। গত এক দশকে যে দ্রুততার সঙ্গে এই শহর সবুজ হারাইয়াছে, সেই

হারও দেশের ৭টি বৃহৎ শহরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সুতরাং, এত সতর্কবাণী হইতেও কলিকাতা এবং তাহার প্রশাসন কোনও শিক্ষা লয় নাই। আগামী দুই দশকের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা অন্তত দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাইবার

আশঙ্কা। বিপন্ন হইবে বিশ্বের প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি মানুষ। এই বাংলাও থাকিবে তাহার মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুনিতেছে কি?

গৌরী সেন কোথায়

আরও এক বার একই প্রশ্নের সম্মুখীন পশ্চিমবঙ্গ। গৌরী সেন কোথায়? সম্প্রতি যে রাজ্য বাজেট পেশ করা হইল, তাহাতে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। লক্ষ্মীর ভান্ডার বা স্বাস্থ্যসাথীর ন্যায় প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়াছে অনেকখানি; আবার শিল্প, পূর্ত ইত্যাদি দফতরের বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ যৎসামান্য। খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের বরাদ্দ সটান কমিয়া গিয়াছে। তাহার পরও প্রায় পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা ঋণ লইতে হইবে রাজ্য সরকারকে। ইহা সত্য যে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ক্রমাগত ঋণ করিয়াও বিবিধ ব্যয়ের পথে সংসারের খরচ বাড়াইয়া চলা যতখানি গর্হিত কাজ, সরকারের পক্ষে ততখানি নহে। অর্থব্যবস্থার স্বার্থেও বটে, সাধারণ মানুষের কল্যাণকল্পেও বটে প্রয়োজনে সরকার ঋণ করিয়াও খরচ করিতে পারে। কিন্তু, ঋণ করিয়া চলাকে অর্থোপার্জনের অপরিহার্য পন্থা করিয়া ফেলিলে মুশকিল। তেমন হইলে ঋণের বোঝা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। প্রতি বৎসরই সুদে-আসলে ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার অঙ্কও বাড়িতে থাকে। ফলে, যে সব খাতে অর্থব্যয় করা সরকারের কর্তব্য, সেখানে টান পড়ে। সেই ব্যয় নির্বাহের জন্য ফের ধার করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ এই দুষ্টচক্রটির মধ্যে পড়িয়া আছে। তাহা হইতে নিস্তার পাইবার কোনও সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতের দিগন্তরেখায় নাই।

এই বৎসর হইতে সমস্যাটি জটিলতর হইবে, তেমন সম্ভাবনা বরং জোরদার। এই বৎসর জিএসটি ক্ষতিপূরণ প্রদানের মেয়াদ শেষ হইবার কথা। ২০১৭ সালে যখন দেশে জিএসটি ব্যবস্থা চালু করা হয়, তখন স্থির হইয়াছিল যে, এই নূতন ব্যবস্থায় যে রাজ্যে অন্তিম পণ্যটি বিক্রয় হইবে, কর আদায় করা হইবে সেই রাজ্যে, যে রাজ্যে পণ্যটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই রাজ্যে নহে। এই পরিবর্তনের ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে কর আদায়ের অনুপাত পাল্টাইয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার জানায় যে, পরবর্তী পাঁচ বৎসর সব রাজ্যে পরোক্ষ করপ্রাপ্তি যেন ন্যূনতম ১৪ শতাংশ হারে বাড়ে, তাহা নিশ্চিত করা হইবে। যে রাজ্যে রাজস্ব বৃদ্ধির হার ১৪ শতাংশের তুলনায় যতখানি কম হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ঘাটতি পূরণ করিয়া দিবে। পরিসংখ্যান বলিতেছে, অতিমারি এবং লকডাউনের কারণে অর্থব্যবস্থা ধাক্কা খাইবার পর এই ক্ষতিপূরণের উপর রাজ্যগুলির নির্ভরতা বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। ২০২২ সালে যদি এই ক্ষতিপূরণ বন্ধ হইয়া যায়, তবে রাজ্যের আর্থিক সংস্থানের উপর তাহার নেতিবাচক প্রভাব পড়িবে।

ঋণও নহে, কেন্দ্রীয় ক্ষতিপূরণও নহে, রাজ্যের কল্যাণ কর্মসূচিকে চালাইয়া যাইতে হইলে রাজস্বের অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও সুস্থায়ী উৎসের প্রয়োজন। তাহার একটিমাত্র পথ রাজ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাহার প্রশস্ততম পথ শিল্পায়ন। জনকল্যাণের সহিত শিল্পোন্নতির যে কোনও বিরোধ নাই, বরং সাযুজ্য রহিয়াছে, এই কথাটি রাজ্যের কর্ণধাররা ইদানীং স্বীকার করেন। সে দিকে জোর দেওয়া প্রয়োজন। সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, বা মহিলাদের হাতে ন্যূনতম বুনিয়াদি আয়ের ব্যবস্থা করা, উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপগুলির গুরুত্ব বিপুল। কেরলের উদাহরণ বলিবে, শুধুমাত্র শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে

সরকারি লগ্নি অর্থব্যবস্থাকে কতখানি অগ্রসর করিয়াছে। কিন্তু, শূন্য রাজকোষে এই কাজগুলিও হয় না। এক কালে বামফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত প্রতি বৎসরই ঘাটতিশূন্য বাজেট পেশ করিতেন। তাহাতে অর্থব্যবস্থার উপকার হয় নাই। এখন বাজেটে বাম জমানার ঋণ বা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কথা বলিলেও লাভ হইবে না। যাহাতে লাভ, সেই কাজগুলি করা বিধেয়।